Living the Lotus 3

Buddhism in Everyday Life

2026
VOL. 246

থাইল্যান্ড

কম্বোডিয়া

জাপান

দক্ষিণ আফ্রিকা

সীমান্ত বিরোধের মধ্যে থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার তরুণদের শান্তি প্রার্থনায় বিশ্বের অন্যান্য সংঘবন্ধুদের অংশগ্রহণ।

Living the Lotus
Vol. 246 (March 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

‘একত্ব’ বোধকে ধারণ করা

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

মানবজাতি এবং বিশ্ব সম্পর্কে পুণ্ডরীক সূত্রের দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর সদস্যদের জন্য যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আধ্যাত্মিক আশ্রয় ও দিকনির্দেশনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তা নিঃসন্দেহে “ত্রিখণ্ড পুণ্ডরীক সূত্র”—অর্থাৎ অমিতার্থ সূত্র, বিস্ময়কর সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এবং বুদ্ধভাষিত সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্বের সাধনা সূত্র। এই তিনটি সূত্রের মধ্যে বিশেষভাবে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে মানবজাতি ও বিশ্বজগতের যে রূপ ও তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই মানবদৃষ্টি মৈত্রী-করুণার চেতনা থেকে উৎসারিত। যা নিজের সুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, চারপাশের মানুষের সুখের পরিধি বৃদ্ধি এবং দুঃখ-কষ্ট লাঘবের অভিপ্রায়ে সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ তথা বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠাই এখানে মানুষের প্রকৃত রূপ। এবং, প্রত্যেক মানুষই মূলত বোধিসত্ত্ব, এই উপলব্ধি নিয়ে যদি নিজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধপ্রকৃতিকে সচেতনভাবে জাগ্রত করে বাস্তবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তবে এই জগৎ—এই সহালোক, অর্থাৎ মানুষের বাস্তব জীবনযাপনের ক্ষেত্র অনতিবিলম্বে শান্তিময় ও পবিত্র আলোকভূমিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এটাই সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি।

অধিকন্তু, সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কিংবা আমাদের নিত্যজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিসরে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, সেগুলির সমাধান কোনো অন্য ব্যক্তি বা কোনো বাহ্যিক শক্তি এসে করে দেবে না। বরং, আমাদের প্রত্যেককে মানবতার পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে, পৃথিবীর বিবর হতে আবির্ভূত বোধিসত্ত্বদের ন্যায় সচেতনভাবে উঠে দাঁড়াতে না পারলে, কোনো সমস্যারই প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়—এমন নির্দেশনা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে নিহিত আছে বলে আমি মনে করি।

হয়তো এটিকে কিছুটা সরলীকৃত ভাবনা বলা যেতে পারে—“আমাদের মতো নাম না জানা সাধারণ মানুষের মধ্যেই জীবনের এবং জগতের সকল সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিহিত আছে।” —সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা মানুষের সেই বোধকে জাগ্রত করে এবং মানুষকে বোধিসত্ত্ব হিসেবে আত্মসচেতন হতে উৎসাহিত করে। এ আত্মবোধের ভিত্তি হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের মূলতত্ত্ব—“সমস্ত জীবন একটিমাত্র মহান জীবনের দ্বারা লালিত” এবং “সবকিছুই এক।” এটাই একত্ববোধের প্রকৃত অর্থ।

একটাই মহাবিশ্ব এবং একটাই পৃথিবী

"আমি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হলো—মানুষকে উদ্ধার করতে চাই"—এ কথাটি একসময় আমাদের প্রতিষ্ঠাতা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। তবে আজ কেন আমি নতুন করে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরলাম? এর কারণ এই যে, আমরা যেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্নের সেই মূল চেতনাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি এবং 'মানুষকে উদ্ধার করা'র যে অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি, তার উৎসকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

সে মূল ভাবনাটি হলো—"সবকিছু এক।" এই উপলব্ধি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের একযান শিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কঠিন দর্শনের ভাষা পরিহার করে সহজভাবে বললে এর অর্থ—মহাবিশ্ব এক, পৃথিবী এক, জগত-সংসারও এক।

মহাবিশ্ব যেন একটিমাত্র জীবন্ত সত্তার মতো ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হতে এগিয়ে চলেছে, আর সেই মহান বিবর্তনের ধারাতেই জন্ম নিয়েছে আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে—মানুষ, প্রকৃতি, প্রাণী ও উদ্ভিদ—সবকিছুই পরস্পরকে বাঁচিয়ে রেখে, পরস্পরের সহায়তায় বেঁচে আছে। এই সত্য আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে সমগ্র মহাবিশ্বকে একটি "মহান জীবন" হিসেবে দেখা, এবং আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সেই মহান জীবনের সঙ্গেই অবিচ্ছিন্নভাবে একীভূত। অর্থাৎ, আমাদের জীবন আলাদা কোনো সত্তা নয়; সব জীবনের সঙ্গেই তা গভীরভাবে যুক্ত। ধর্মের জগতেও আমরা এই একই উপলব্ধির প্রতিফলন দেখতে পাই। নানা ধর্ম, নানা মত-পথ ও নানা ভাষায় প্রকাশ পেলেও, অধিকাংশ ধর্মের অন্তর্নিহিত শিক্ষা এক—সকল সত্তার একত্ববোধ, এবং মৈত্রী-করুণা ও ভালোবাসার চেতনা। সর্বোপরি, ঈশ্বর কিংবা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অনুভূতিতে মানবজাতি মূলত এক অভিন্ন হৃদয়ে আবদ্ধ। এই কারণেই, কেবল ধর্মাচারীদের নয়—প্রত্যেক মানুষেরই উচিত নিজের ও অপরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য খোঁজার পরিবর্তে, নিজেদের মধ্যে নিহিত সাদৃশ্য ও ঐক্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো। আমরা যদি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা সবাই "এক", তবে আমাদের হৃদয়ে জন্ম নেবে আরও গভীর করুণা, সহনশীলতা ও উদারতার চেতনা। এর ফলেই প্রসারিত হতে পারে এমন এক "পরিত্রাণের জগৎ", যা মানুষের জীবনে শান্তি ও আশার আলো নিয়ে আসে। তবুও বাস্তবতা এই যে—এই সত্য জানা সত্ত্বেও, মানুষ বারবার সেই একত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা বলেন—"প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব স্বকীয়তা আছে। তার নিজস্ব অবস্থান ও পরিস্থিতি আছে। এসব বুঝতে পারলে, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি এক উদার ও সহনশীল মনোভাব আমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হয়।" অন্যদিকে, ১৯৭৯ সালে আয়োজিত তৃতীয় বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন "বিশ্ব এখন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অতিক্রম করে আঞ্চলিকতার দিকে, এবং বিশ্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য—এটি স্পষ্ট।" এটি এমন একটি সতর্কবার্তার মতো শোনাচ্ছে যা পৃথিবী এবং বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়। সেই সময় থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। তবুও, আমাদের এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার আদর্শ—"মানুষকে উদ্ধার করা"—এই মহৎ উদ্দেশ্য এখনো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি—এই উপলব্ধি আমাদের অন্তরে এক গভীর বেদনার সঞ্চার করে। তাই আজ, পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনায়, "আমরা সবাই এক"—এই উপলব্ধিকে পুনরায় হৃদয়ে ধারণ করে, এক ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব ও অঙ্গীকারকে আমরা নতুন করে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে চাই।

'কোসেই' মার্চ ২০২৬ইং।

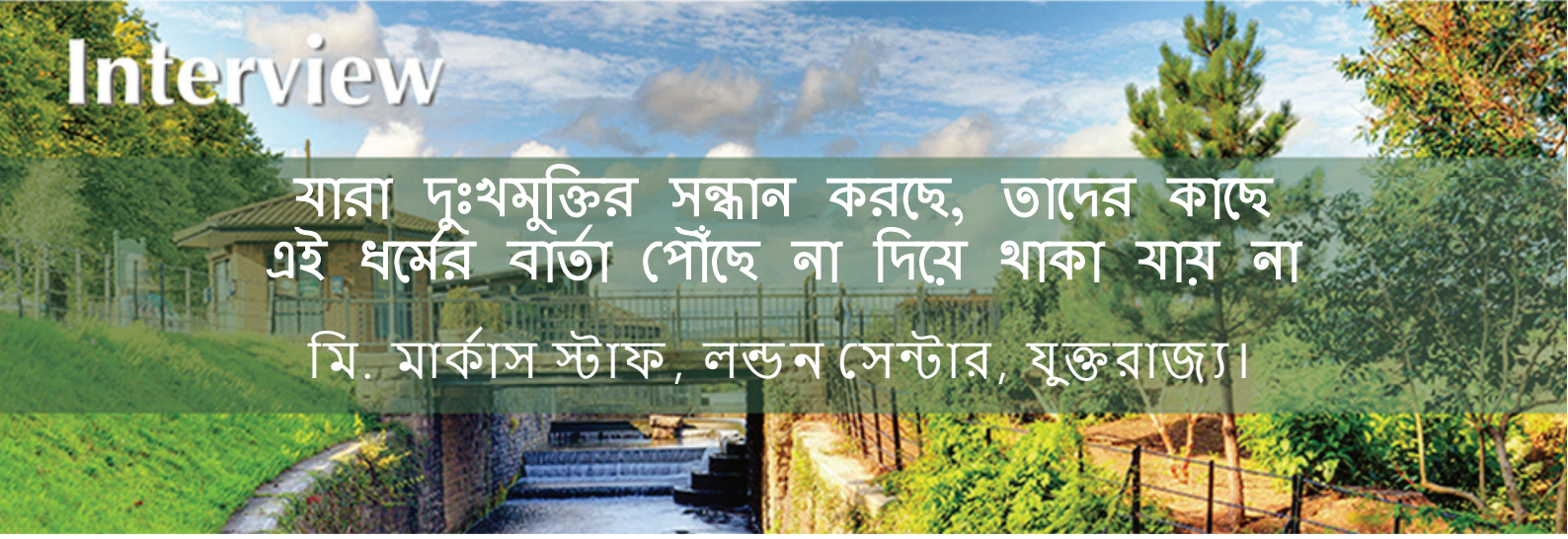

Interview

যারা দুঃখমুক্তির সন্ধান করছে, তাদের কাছে এই ধর্মের বার্তা পৌঁছে না দিয়ে থাকা যায় না

মি. মার্কাস স্টাফ, লন্ডন সেন্টার, যুক্তরাজ্য।

রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের শিক্ষার সঙ্গে কখন এবং কিভাবে পরিচিত হয়েছিলেন?

আমি প্রথম রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হই ২০০১ সালে। কৈশোর থেকেই ধর্ম এবং বস্তুজগতের বাইরে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন বই পড়তে থাকি। সেই সময় *"FIRE IN THE LOTUS"* নামের একটি বই পড়ি, যেখানে পুণ্ডরীক সূত্র ও নিছিরেন বৌদ্ধধর্মের কথা আলোচনা করা হয়। বইটির বিষয়বস্তু আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অনুরণিত হয় এবং বইটির পাতায় রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমার নজর কেড়ে নেয়।

এরপর আমি তখন অক্সফোর্ডে থাকা রেভারেন্ড মেগুমি হিরোতা মহোদয় (বর্তমানে রেভারেন্ড মেগুমি ওয়াদা, সদর দপ্তরের মহাব্যবস্থাপক) এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সরাসরি তাঁর কাছ থেকে রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের শিক্ষা ও সাধনা সম্পর্কে জানতে পারি। ধীরে ধীরে আমি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও হোজায় অংশগ্রহণ করতে থাকি এবং যুক্তরাজ্যের সংঘের একজন সদস্য হিসেবে অনুশীলন শুরু করি। ২০২০ সালে লন্ডন সেন্টার খোলার আগে, আমি মূলত সাউথ ওয়েলসের কার্ডিফে (লন্ডন থেকে প্রায় ২৫০ কিমি দূরে) সংঘের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধর্মপ্রচার চালিয়ে আসি।

এই পর্যন্ত ধর্মানুশীলনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

২০০৬ সালে তৃতীয় বিশ্ব সংঘ সমাবেশে যোগদান আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। সেই সময় আমি বিষণ্নতার সঙ্গে লড়াই করছিলাম এবং প্রতিদিন কষ্টকর জীবনযাপন করছিলাম। যখন লস অ্যাঞ্জেলেস ধর্ম কেন্দ্রের একজন সদস্য সদর দপ্তরের গ্রেট স্যাক্রেড হলে তার অভিজ্ঞতার বক্তব্য রেখেছিলেন। তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমার হৃদয় গভীরভাবে

মি.মার্কাস স্টাফ

নাড়া দেয় এবং আমি অনুপ্রাণিত হই। তিনি একাধিক ব্রেন টিউমারের অস্ত্রোপচার সহ নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েও, ধর্মবিশ্বাসের শক্তিতে নিজের মনকে দৃঢ় করেছিলেন। গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখেছিলেন এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তার এই অভিজ্ঞতা শুনে আমি বুঝতে পারি যে, আমার বিষণ্নতাকে কেবল দূর করার দিকে মনোযোগ দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং অসুস্থতাকে আমার জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে "অসুস্থতার সঙ্গে বেঁচে থাকা" এই মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব। একই সঙ্গে আমি প্রতিদিন জীবিত থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে শিখি। আমি ভাবি, পুণ্ডরীক সূত্র, রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে হয়তো অন্যদের সাহায্য করতে পারব।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সকল বস্তু অস্থায়ী—এই শিক্ষার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি যে ভালো বা

খারাপ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যেহেতু সবকিছু ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন এবং এখানে মনোযোগ দিয়ে জীবনযাপন করতে, সামনে আসা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এবং প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ করে তুলতে।

শুনেছি বর্তমানে আপনি ওয়েলস ধর্মপ্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, দৈনন্দিন জীবনে কিরূপ মনোভাব নিয়ে মিশনারী কাজ করছেন?

যারা এখন মুক্তির সন্ধান করছেন এবং এই শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করছেন, তাদের কাছে এই চমৎকার শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। এই অনুভূতি থেকে আমি ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত থাকি। আমি বিশ্বাস করি, রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা সর্বজনীন—যে কোনো সময়, যে কোনো মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটি ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়। এটিই রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ। এই দৃঢ় বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করে আমি লোটাস সূত্রের শিক্ষাগুলি যতটা সম্ভব মানুষের সঙ্গে ভাগ করে দিতে চাই, যেন তারা মুক্তি পায় এবং সুখী হয়—ঠিক যেমন আমি নিজে উপকৃত হয়েছি। এই উদ্দেশ্য পূরণে সংঘবন্ধুদের সমর্থন অপরিহার্য, এবং আমি আন্তরিকভাবে চাই এই বৃত্তটি আরও প্রসারিত হোক।

নিজ বাড়ির বুদ্ধের আসনের সামনে সাউথ ওয়েলস সংঘের সসস্যদের সাথে মি.মার্কাস।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের একজন সদস্যের বাড়িতে সূত্রপাঠে দওসির দায়িত্ব পালন করছেন মি.মার্কাস স্টাফ।

গত অক্টোবরে আমি গ্রেট স্যাক্রেড হলে ধর্ম শিক্ষকের সনদ অর্জন করেছেন, সনদ প্রাপ্তির পরবর্তীর অনুভূতি সম্পর্কে বলুন।

এটি আমার জন্য একটি মহান সম্মান এবং রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর সদস্য হিসেবে বহু বছর ধরে অনুশীলন করে আসার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমি এটিকে অনুশীলনের নতুন পর্যায়ের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি বিশেষভাবে দুটি অঞ্চলে মিশনারী কার্যক্রমে মনোযোগী হতে চাই—সাউথ ওয়েলস, যেখানে আমি বাস করি, এবং ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস। এখানে আমি সদস্যদের সাথে ধর্মীয় সংযোগ বাড়াতে চাই এবং নিয়মিতভাবে আমার বাড়ি বা স্থানীয় সদস্যদের ঘরে রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর মৌলিক অনুশীলন, যেমন সূত্র পাঠ এবং হোজা (ধর্ম বৈঠক) পরিচালনা করতে চাই।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর কোন দিকগুলো আকর্ষণীয় মনে হয়?

আমি আগেই বলেছি যে রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষাগুলি সর্বজনীন এবং ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম হিসেবে জীবনে প্রয়োগযোগ্য। তাছাড়া, আমার মতে হোজা (ধর্ম বৈঠক) এটি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। হোজা এমন একটি স্থান যেখানে আমরা জীবনের আনন্দ, দুঃখ ও কষ্ট একসাথে সংঘের সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায়। একে অপরকে

উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, এবং বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে পথচলা। আমি এটিকেই হোজা অনুশীলন মনে করি। হোজায় বসে, অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে এবং সহানুভূতির সঙ্গে শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করুণার সঙ্গে শুনলে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই উন্মুক্ত হয়, তাদের মানসিক ভার হালকা হয়, এবং তারা মন শান্ত রেখে তাদের কষ্ট ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

পরিশেষে, আপনার ভবিষ্যত ধর্মানুশীলনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানাবেন কি?

ব্যক্তিগতভাবে, আমি প্রতিদিনের সূত্রপাঠ, হোজা (ধর্ম বৈঠক) অনুশীলন এবং নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন চালিয়ে যেতে চাই। এভাবে একজন নিবেদিত ধর্মবিশ্বাসী হিসেবে নিজেকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। অধিকন্তু, একজন নেতা হিসেবে সংঘের সকল সদস্যকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমর্থন করা আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ওয়েলসে প্রথম ব্রিটিশ ধর্ম শিক্ষক হিসেবে আমি আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের সংঘ থেকে আরও অনেক ধর্ম শিক্ষক গড়ে উঠবে। এই প্রত্যাশা ও দৃঢ় সংকল্পকে মাথায় রেখে, আমি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা চালাবো।

২৩শে নভেম্বর, ২০২৪ইং তারিখে লন্ডন সেন্টারের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সংঘ সদস্যদের সাথে (দ্বিতীয় সারিতে, ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)।

ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ধর্মানুশীলন করুন এখানে, এখনই

দশস্বরূপতা: ‘সত্তা’ শক্তি’ ‘ক্রিয়া’

গত মাসের ধারাবাহিকতায় রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ড. ডমিনিক স্কালাঞ্জেলো এর রচিত “এখানেই সাধনাক্ষেত্র” শীর্ষক ভাবনাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। “এখানেই সাধনাক্ষেত্র”—এই ধারণাটি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের “তথাগতের দৈবশক্তি” অধ্যায়ে বর্ণিত সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো স্থানই সাধনার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। “এখানেই, এখনই সাধনার ক্ষেত্র”—এই শিক্ষা আমাদের নীরবে অনুপ্রাণিত করে, যেন পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় অথবা দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো পরিসরেই আমরা ধর্মবাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করি এবং বোধিচিত্তকে জাগ্রত করি।

ডঃ ডমিনিক স্কালাঞ্জেলো

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে বর্ণিত দশস্বরূপতার শিক্ষার উপর মনোনিবেশ করেছিলাম। “দশস্বরূপতা” বলতে বোঝায়—যে কোনো বস্তু বা ঘটনার উদ্ভব ও বিকাশের অন্তর্নিহিত দশটি পর্যায়। এই শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করা দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের বাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি—আমাদের মন ও আচরণ কীভাবে দুঃখ কিংবা সুখের জন্ম দেয়। ফলে আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থাকে তাৎক্ষণিক সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় দশস্বরূপতার প্রথম দুটি দিক—“অবয়ব বা রূপ” এবং “স্বভাব বা প্রকৃতি”—নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, আচরণ, অঙ্গভঙ্গি কিংবা মুখভঙ্গির মতো বাহ্যিক প্রকাশ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের অন্তরও পরিবর্তিত হতে পারে। প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারণায় বাহ্যিক রূপকে অন্তরের অবস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে—বাহ্যিক আচরণও অন্তরের অবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মে শিষ্টাচার, সংযম এবং সঠিক আচরণকে গুরুত্ব দেয়া হয়। রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল আচরণকে অন্তরের প্রশান্তি গড়ে তোলার একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করে।

এবার আমরা দশস্বরূপতার মধ্যে পরবর্তী তিনটি ধাপ—সতন্ত্র সত্তা, সতন্ত্র শক্তি এবং সতন্ত্র ক্রিয়া—নিয়ে আলোচনা করব। সতন্ত্র সত্তা বলতে বোঝায় আমাদের অস্তিত্বের সমগ্রতা। এটি অন্তরের অবস্থা—প্রকৃতি বা স্বভাব এবং বাহ্যিক প্রকাশ—অবয়ব বা রূপ একত্রিত হলে গঠিত হয়। সহজভাবে বললে, অবয়ব + প্রকৃতি = সত্তা, অর্থাৎ রূপ ও স্বভাবের মিলিত ফলেই সত্তা সম্পূর্ণ হয়।

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন, এই জগতে বিদ্যমান প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে—শক্তি এবং ক্রিয়া। শক্তি হলো সম্ভাব্যতা বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। ক্রিয়া হলো সেই সম্ভাব্যতা বা ক্ষমতা যখন বাহ্যিক কর্ম বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

দশলোকভূমির নরকের স্তর, অর্থাৎ রাগের অবস্থার মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যায়। যখন আমরা রাগের বশবর্তী হই, তখন আমাদের মন এবং দেহ এমন এক অবস্থায় পৌঁছায় যা কথাবার্তা বা আচরণের মাধ্যমে অন্যকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি করতে পারে। এটি ঠিক যেন শক্তভাবে বাঁধা খেলনার স্প্রিং বা গোলা ভর্তি বন্দুক—যেখানে শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং সুযোগ পেলেই তা বিস্ফোরিত হতে পারে।

ক্রিয়া (এই ক্ষেত্রে, রাগ প্রকাশ করা এবং এমন পদক্ষেপ নেওয়া যা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে) তখন ঘটে যখন সঞ্চিত চাপা রাগের শক্তি এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। অন্য কথায়, এটি সেই মুহূর্ত যখন সুপ্ত শক্তি কার্যকর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

কারণ মনের অবস্থা প্রায়শই আমাদের কর্মকে পূর্বাভাস দেয়, তাই নিজের মন এবং আচরণের প্রতি সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। যদি আমরা “রূপ” (অবয়ব) এবং “স্বভাব” (প্রকৃতি) স্তরে সময়মতো মনোযোগ দিয়ে নিজের গতিপথ সংশোধন করতে পারি, তবে রাগের নেতিবাচক শক্তি বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় না।

অন্যদিকে, যদি আমরা প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছাই এবং সেই মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজেদের পরিচালনা করতে পারি, তবে আমরা প্রজ্ঞাভিত্তিক যথাযথ কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা অর্জন করি। এর মাধ্যমে অন্যদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা এবং সমাজকে আরও উজ্জ্বল, শান্তিপূর্ণ ও প্রফুল্ল করা সম্ভবপর হয়।

যদি কখনও কারও দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকাই বা কঠোর আচরণ করি, তখন আমাদের উচিত নিজের আবেগ ও মানসিক অবস্থাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। রাগের প্রকৃত কারণ কখনও অন্য ব্যক্তি নয়। দশস্বরূপতা আমাদের এ শিক্ষা দেয়। রাগের “হেতু” নিজের মধ্যেই নিহিত, আর অন্য ব্যক্তি কেবল “প্রত্যয়”

বা উপলক্ষ মাত্র। অর্থাৎ আমরা আমাদের অন্তরের বিদ্যমান রাগ বা নেতিবাচক শক্তিকে অন্যের মাধ্যমে প্রকাশ করি।

অনেক সময় দেখা যায়, একই পরিস্থিতিতে কিছু মানুষ শান্ত থাকতে পারেন, আবার অন্যরা রাগে ফেটে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ, যখন সুপারমার্কেট বা সরকারি অফিসে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়, তখন কিছু মানুষ স্থির ও ধৈর্যশীল থাকেন, আবার কেউ তাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। একই পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়। এই ভিন্নতা ব্যক্তির মানসিক অবস্থার পার্থক্যের ফল। অর্থাৎ, পরিস্থিতি মানুষকে রাগান্বিত করে না; বরং রাগের মূল কারণ ব্যক্তি নিজে।

যখন আমরা আশপাশের মানুষের প্রতি উচ্চস্বরে কথা বলি, রাগ প্রকাশ করি বা কঠোর আচরণ করি,—তখন আসলে অন্যের ওপর নয়, নিজের অন্তর্গত অস্থিরতার প্রতিই ক্ষুব্ধ হই। আমাদের রাগ অন্য কেউ সৃষ্টি করে না; বরং আমরা রাগ করি কারণ সেই প্রবণতা আমাদের নিজেদের মধ্যেই নিহিত। যখন আমরা মনে করি—"অমুক আমাকে রাগিয়েছে", তখন অজান্তেই আমরা "হেতু" ও "প্রত্যয়"-এর অবস্থান বদলে ফেলি। বাস্তবে অন্য ব্যক্তি কেবল "প্রত্যয়"—অর্থাৎ একটি উপলক্ষ মাত্র; প্রকৃত "হেতু" আমরা নিজেরাই। এই সত্য গ্রহণ করতে পারলে আমরা নিজের আচরণের দায়িত্ব নিতে শিখি এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে পরিবর্তনের পথে সচেতনভাবে এগোতে পারি। কিন্তু যদি আমরা "হেতু" ও "প্রত্যয়"-কে উল্টে দিয়ে রাগের দায় অন্যের ওপর চাপাই, তবে মুক্তি ও সুখ কামনা করলেও সেই লক্ষ্য অর্জনের চেতনা অন্তর থেকে উৎসারিত হয় না।

এই পর্যায়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো—অন্যকে দোষারোপ করা নয়, বরং নিজের ভেতরে কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে তা নিজেকেই প্রশ্ন করা। আমার মন কীভাবে কষ্ট পাচ্ছে? সেই কষ্ট লাঘব করার জন্য আমি কী করতে পারি? এই দুঃখ দূর করতে কি অনুশীলন করতে পারি?—এই ধরনের আত্মজিজ্ঞাসা আমাদের মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়।

আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, ইতিমধ্যেই "হেতু", "প্রত্যয়" এবং "ফল"—এই তিনটি বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। এই বিষয়গুলো নিয়ে আগামী সংখ্যায় আরও বিস্তারিত শিক্ষা নেয়ার আশা রাখি।

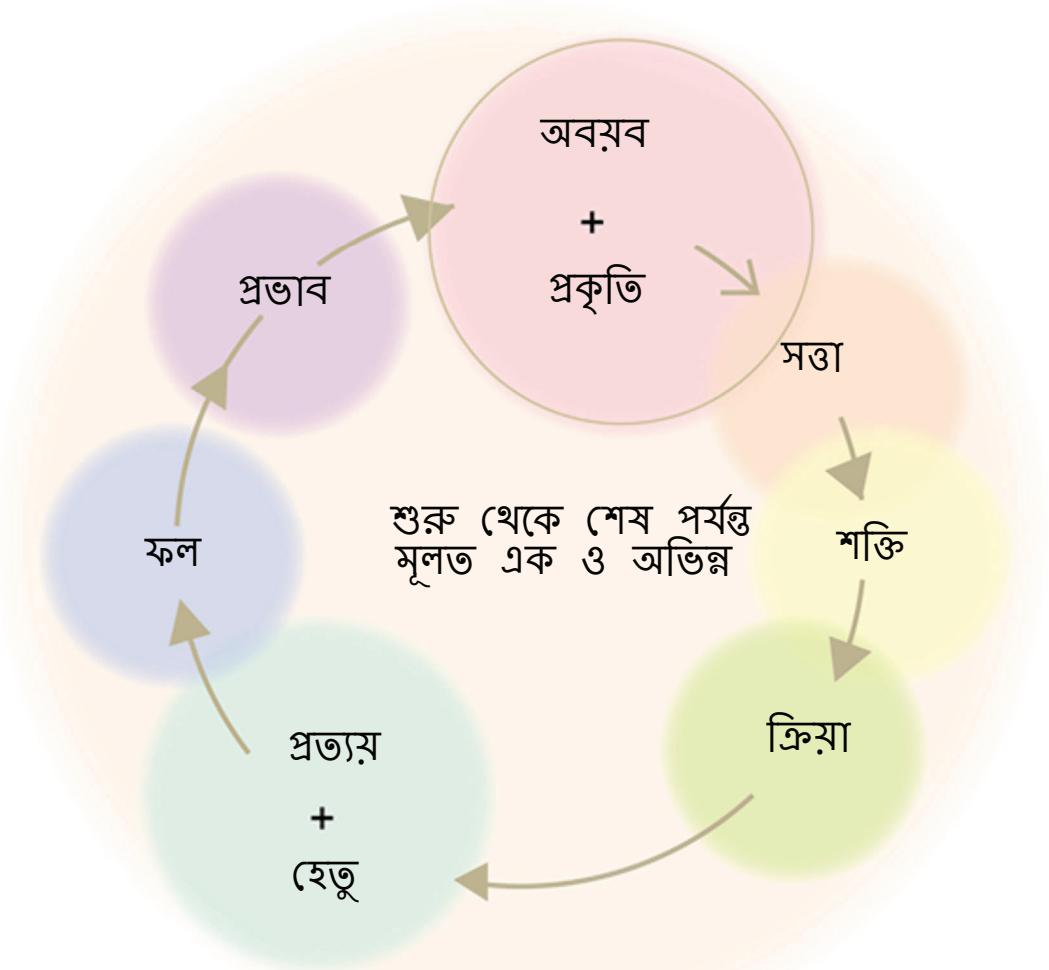

সংঘের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

রেভারেন্ড ক্রিস পিটার্স
ব্রাঞ্চপ্রধান, ওকলাহোমা, যুক্তরাষ্ট্র।

হোজা, তেদরি এবং আরোগ্য প্রদায়ক সম্প্রদায়ের শক্তি

২০২৪ সালের অধিকাংশ সময় জুড়ে, ওকলাহোমা ধর্মকেন্দ্রে ত্রিশের কোঠার এক তরুণ নিয়মিতভাবে আসতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয়, ভদ্র, মৃদুভাষী ও নম্র স্বভাবের। অধিকাংশ সময় তিনি নীরবে অন্য সদস্যদের কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন; তবে রবিবার সকালের ধর্মসভা (হোজা)-য় মাঝে মাঝে তিনি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতেন। সংঘের সঙ্গে তাঁর সময় কাটানো ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে, একসময় তিনি আমাদের সামনে তাঁর জীবনের এক গভীর ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উন্মোচন করেন। তিনি জানান, উচ্চশিক্ষার জন্য নিজ শহর ত্যাগ করে অন্য এক অঙ্গরাজ্যে বসবাসকালে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আমাদের আরও জানান যে, বর্তমানে তাঁর রোগটি উপশম অবস্থায় রয়েছে। রোগ উপশম হয়েছে এবং আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই—এই সংবাদে আমরা সবাই একপ্রকার স্বস্তি অনুভব করি। তবুও, তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর অন্তরের গভীরে যেন এখনো এক ধরনের অদৃশ্য মানসিক চাপ ও সূক্ষ্ম অস্থিরতা রয়ে গেছে। কিন্তু সে সময় আমি অনুধাবন করতে পারিনি—এই অন্তর্লীন ভারের উৎস কোথায়, কিংবা কীভাবে তাঁকে প্রকৃতপক্ষে সহায়তা করা যেতে পারে।

২০২৫ সালের জানুয়ারির শুরুতে, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং রবিবারের প্রার্থনাসভা ও ধ্যানচর্চায় আরও নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনি আগের তুলনায় অনেক বেশি আমার ও সংঘের সঙ্গে খোলামেলা হতে থাকেন এবং 'তেদরি' অনুশীলনেও অংশ নিতে শুরু করেন। এই সময়, আমি এমন এক পরিবেশেরও সাক্ষী ছিলাম, যেখানে সংঘের সদস্যরা সেই বছর তাঁদের প্রিয়জন হারানোর বেদনাময় অভিজ্ঞতা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছিলেন। সেখানে কেউ সরাসরি উপদেশ দিচ্ছিলেন না; বরং সবাই মনোযোগ দিয়ে একে অপরের কথা শুনছিলেন এবং প্রত্যেকের অনুভূতিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করছিলেন।

জীবনের এত অল্প বয়সে, অর্থাৎ বিশের কোঠাতেই, জীবন-সংকটময় এক রোগের মুখোমুখি হয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়ার কঠিন অভিজ্ঞতা তিনি আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি, আমেরিকার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলো তাঁর সেই দুর্ভোগকে আরও তীব্র করে তুলেছিল, যা তাঁর জন্য বিশেষ মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি, ক্যান্সার চিকিৎসাজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, এবং গুরুতর অসুস্থতার কারণে সহপাঠীদের থেকে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তিনি যখন ধারাবাহিকভাবে 'তেদরি' এবং হোজায় অন্যদের অভিজ্ঞতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন, তখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম—ওকলাহোমা শাখায় আসা শুরু করার পর থেকে প্রায় এক বছর ধরে তিনি যে মানসিক চাপ ও অন্তর্গত উত্তেজনা বহন করে আসছিলেন, তা ধীরে ধীরে প্রশমিত ও রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। এই অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর জন্যই এক আরোগ্যময় যাত্রা ছিল না; আমার কাছেও এটি ছিল এক অমূল্য শিক্ষা। আমি উপলব্ধি করলাম যে, 'হোজা' ও 'তেদরি'—এই উভয় অনুশীলনের মধ্যেই মানুষের অন্তরকে নিরাময় করার গভীর শক্তি নিহিত রয়েছে। হোজার সময়ে, নিজের ও অপরের মধ্যে একটি মানসিক পরিসর বজায় রাখা—অর্থাৎ অযথা অন্যের অন্তর্জগতে অতিরিক্ত প্রবেশ না করা—এটি সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য এক মৌলিক সচেতনতা হয়ে ওঠে। এর ফলে পারস্পরিক আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ অটুট থাকে। এমনকি পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলেও, তাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দুঃখের রূপান্তর সম্ভব—এই উপলব্ধিও সেখানে জন্ম নেয়। এই ধরনের হোজা-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে, এবং তার ফলস্বরূপ সদস্যরা মানসিক প্রশান্তি ও আস্থার সঙ্গে 'তেদরি'তে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন।

জীবনের এক অবিচল সত্য হলো অনিত্যতা; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হই। অসুস্থতা তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। তদুপরি, প্রিয়জনের মৃত্যু, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ, এমনকি বিশ্বপরিস্থিতির সংবাদও আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তবুও, প্রতি রবিবার সকালে—পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন—সংঘ সবসময় সেখানে উপস্থিত থাকে। এটি এমন এক স্থান, যেখানে আমাদের অন্তরের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা হয় এবং আমরা নিজেকে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারি। সংঘ এক নিরাপদ ও আশ্রয়দায়ী সামাজিক পরিসর। অনেকের জন্য, সংঘ এমন এক স্থান—"যেখানে সবকিছু পরিবর্তনশীল হলেও, এই একটিমাত্র আশ্রয় সর্বদা অপরিবর্তিত থেকে যায়; এটি চিরকাল নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।"

মানুষকে লালন করার আনন্দ

সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

এইভাবে লালিত-পালিত হয়ে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে মানুষের কল্যাণে, বিশেষত তাঁদেরকে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করা—এটাই আমার জীবনের সত্যিকার লক্ষ্য। একে একে মানুষকে পথ দেখাতে দেখাতেই, অজান্তেই আজকের রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের রূপ গড়ে উঠল।

মানুষকে পথ দেখানো ও গড়ে তোলার কাজ আমার কাছে কখনোই কষ্টকর হয়নি; বরং এটি এমন এক আনন্দ, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পৃথিবীতে এত গভীর সুখ এনে দেয় এমন কাজ আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমার অভিজ্ঞতায়, মানুষকে লালন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—তার ভিতরে থাকা বিশেষ গুণ বা শক্তিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই উন্নতি করার এবং অন্যের উপকারে আসার এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে—এটাই তার বুদ্ধত্ব। তাই সেই বুদ্ধত্বের প্রকাশকে করুণার চোখে লক্ষ্য করতে পারলে, প্রকৃত অর্থে আমরা তাকে "লালন" করতে পারি। আমার দাদা ও পিতা আমাকে যে মমতার সঙ্গে মানুষ করেছেন—তা ছিল ঠিক এই সহানুভূতিশীল লালনেরই প্রতিচ্ছবি।

অন্যদিকে, কেউ কেউ মনে করেন—"মানুষের ত্রুটি-দোষ না শোধরালে সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।" কিন্তু কঠোর সমালোচনা মানুষকে নিরুৎসাহিত করে, মনকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। শুধুই ত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে, হৃদয়ে কোমলতা

রেখে মানুষের গুণাবলির দিকে নজর দেওয়া জরুরি—বিশ্বাস রাখতে হবে, তার কোনো না কোনো অংশে অবশ্যই বুদ্ধত্বের প্রকাশ ঘটতে পারে।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে— "বোধিসত্ত্ব করুণাপূর্ণ নয়নে সকল প্রাণীকে অবলোকন করেন; তাঁর দেওয়া সুখ ও সমৃদ্ধি সাগরের ন্যায় অপরিমেয়" (অবলোকিতেশ্বরের দ্বার সর্বদিকে অধ্যায়' থেকে) এভাবে উল্লেখ আছে। অতএব, আমরা যখন মানুষের দিকে করুণার চোখে তাকাই, তখন আমরাও এক বিশেষ আনন্দ ও আশীর্বাদের সাগরে ভরে উঠি।

বাস্তব জীবনে নানা কঠোরতা থাকলেও, জীবনের পথ চলা ও কোসেই-কাইয়ের সাধনাকে সুমো ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়— "বাড়ি ও কর্মস্থলের জীবন হলো আসল প্রতিযোগিতার ময়দান, আর কোসেই-কাইয়ের ধর্মাসন হলো অনুশীলনের ক্ষেত্র।"

কারণ সেখানে দায়িত্বশীলগণ আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেন—কীভাবে বাস্তব জীবনে ভুল না করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আমার পিতা যেমন আমাকে ঘাস কাটার পদ্ধতি হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন, তেমনি ধর্মাসনেও ধাপে ধাপে বাস্তব অনুশীলন শেখানো হয়। তাই ধর্মাসন হচ্ছে পারস্পরিক লালন-পালনের স্থান—একটি অভিভাবক-পাখির ডানার মতো আশ্রয়।

মানুষকে লালন করা, মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করা—এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। কারণ এটি নিজের বুদ্ধত্বকে প্রকাশ করে বোধিসত্ত্বের পথের অনুশীলন। আর যখন আমরা অন্যকে গড়ে তুলি, তখন নিজের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে উন্নতি আসে, আত্মবিশ্বাস জন্মায়। যত বেশি মানুষকে পথ দেখাই ও লালন করি, ততই লালনের আনন্দ গভীর হয় এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা আরও মহান 'পুণ্যফল' অর্জন করি।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ. ৯৩-৯৪।

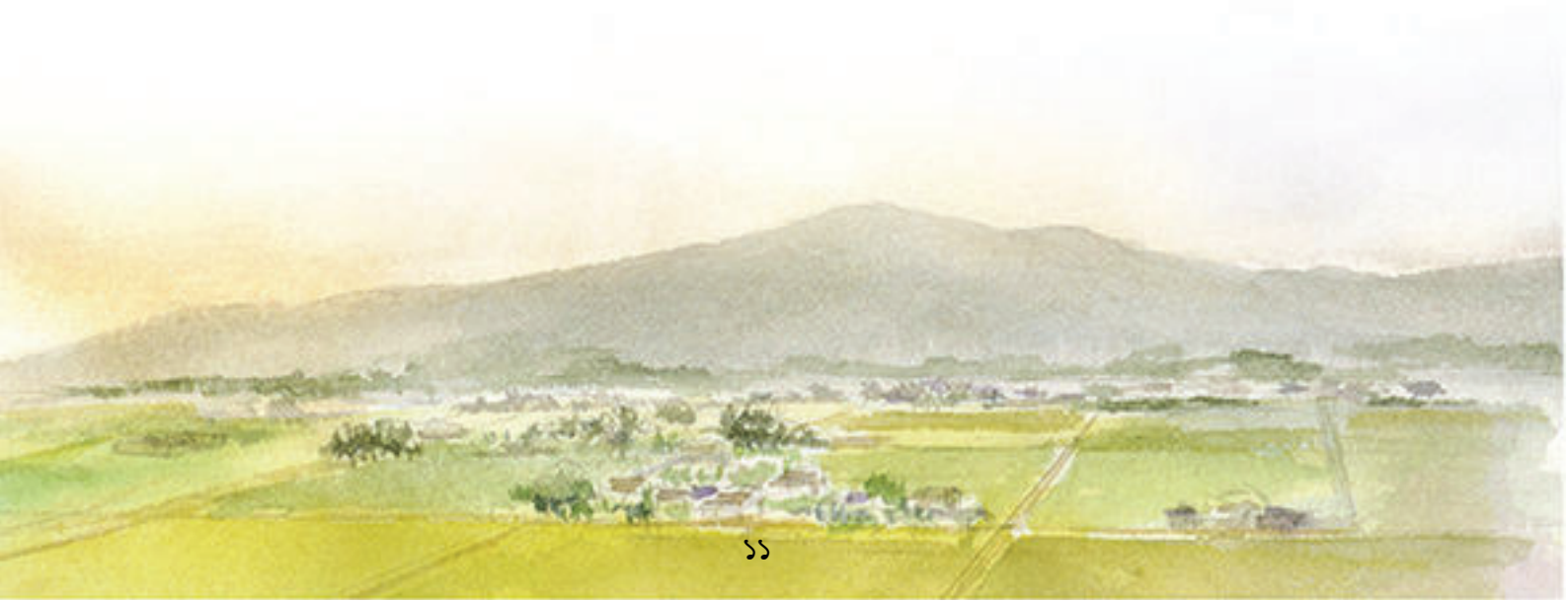

'সবই এক' এই মূল চেতনায় ফিরে আসা

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আজ থেকে ৮৮ বছর আগে, ১৯৩৮ সালের ৫ মার্চ, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন—"আমি একটা উদ্দেশ্যেই এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছি—মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে চাই।" এই মহান সংকল্পের মূল শক্তি এসেছে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের 'একযান' দর্শন থেকে—"সবকিছুই এক, অবিভাজ্য।" আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হলো—যা আসলে এক, তাকে আমরা আলাদা করে দেখি। মন আর শরীর, আমি আর অন্য মানুষ, মানুষ আর প্রকৃতি, বিশ্বাস আর দৈনন্দিন জীবন—সবকিছুকেই আমরা আলাদা ভাবি। কিন্তু বাস্তবে এসব আলাদা নয়; সবই গভীরভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র আমাদের শেখায়—"এই জায়গাটাই সাধনার ক্ষেত্র"। অর্থাৎ, আমরা যেখানেই থাকি, সেখানেই আমাদের সাধনার জায়গা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনই আসল ধর্মচর্চা। যেমন, যখন মন অস্থির হয়, তখন শরীরও তার প্রভাব দেখায়। এইভাবে আমরা নিজের ভেতরের সংকেত, বা বুদ্ধের আহ্বান অনুভব করতে পারি। আর তখনই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের শিক্ষা কাজে লাগাতে পারি। ধর্ম শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা আমাদের প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা, কষ্ট আর সংগ্রামের মধ্যেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা একা—কিন্তু আসলে আমরা কেউই একা নই। অন্য মানুষ, প্রকৃতি এবং পুরো সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন টিকে আছে।

এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মাসে, আসুন আমরা আবার আমাদের মূল কথায় ফিরে যাই—"সবকিছুই এক।" এই উপলব্ধি হৃদয়ে রেখে, আমরা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের পূর্বসূরিদের সাধনা ও ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাদের স্বপ্নকে আজকের কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাই আমাদের দায়িত্ব।

৯ই ফেব্রুয়ারি, গাকুরিন ওমে ক্যাম্পাসে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সাথে

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

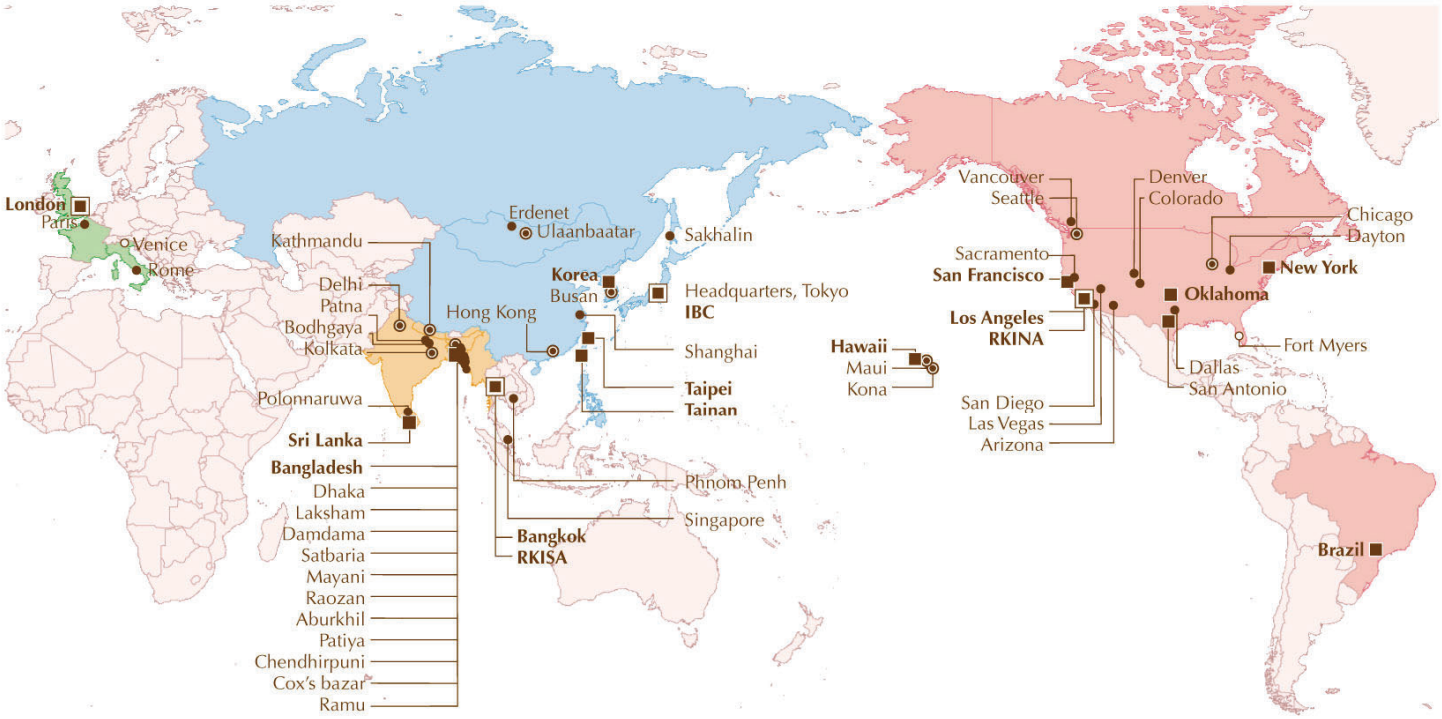

Information about local Dharma centers

facebook

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp